অগ্নিযুগে বিপ্লববাদের নেপথ্যে

ড. অচিন্ত্যকুমার মাইতি

GRANTHA TIRTHA CALCUTTA

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

প্রতিটি বিপ্লবী-সংঘটনের পেছনেই প্রয়োজন বিপ্লবের একজন প্রাণপুরুষকে যিনি সর্বদাই বিপ্লবীর হৃদয়ে বিরাজ করে প্রতিনিয়ত তাকে সঠিক পথের দিশা দেখাবেন। বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সকল বিপ্লবীর অবস্থান ছিল স্বামী বিবেকানন্দের ছত্র ছায়ায়। স্বামীজি ১৯০১ সালের ১৩ এপ্রিল ঢাকাতে অনুষ্ঠিত এক সভায় তরুণদের উদ্দেশে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, 'পরাধীন জাতির ধর্ম নেই— তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তি লাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।' তরুণ দলে ছিলেন একজন স্বনামধন্য বিপ্লবী, নাম বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ। হেমচন্দ্র ঘোষ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর এক স্মৃতিচারণে বলেন, 'স্বামীজির সেদিনের অগ্নিময় বাণী বিপ্লবী আন্দোলনে মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল।'

স্বামীজির নির্দেশিত পথ ধরে বিপ্লবীরা প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্ব শুরু করে দিলেন। প্রথমে শরীরচর্চা, তারপর দুর্বলতা পরিহার করে বীর হয়ে ওঠা, পরিশেষে মৃত্যুর কবলিত না হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। বীরাঙ্গনা সরলাদেবী তাঁর বীরাষ্টমী ব্রতের মাধ্যমে ছেলেদের বীর করে তুললেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগিয়ে দিলেন। বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়ের কৌশল শেখালেন। আধ্যাত্মিক জীবনের অনুসন্ধানে শ্রী অরবিন্দ অবশ্য মাঝপথে থেমে যান। কিন্তু বিপ্লব থেমে নেই। বিপ্লবের রথ এগিয়ে চলল।

ভগিনী নিবেদিতার কাজ ছিল বিবেকানন্দের তৈরি ক্ষেত্রে বিপ্লবের বীজ ছড়ানো। এই কাজটি তিনি করেন ভারতীয় বিপ্লববাদীদের প্রেরণাদাত্রী রূপে। বিবেকানন্দ

ভারতীয় বিপ্লবাদের যে যজ্ঞবেদি রচনা করেন, ভগিনী নিবেদিতা তারই বুকে জ্বালিয়ে দেন বিপ্লবের হোমাগ্নি শিখা। তা থেকে উৎপন্ন লেলিহান শিখা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সেই অগ্নিময় শিখা সাহিত্য, কাব্য, গান ও নাটকে এক আশ্চর্য উন্মাদনাময় জাগরণ ঘটালো। এঁদের লেখনী সেদিন দেশবাসীকে বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহ জুগিয়েছিল।

অগ্নিযুগে বিপ্লবীদের নেপথ্যে থেকে যাঁরা বিপ্লবী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, যাঁরা তাঁদের মনোবল জুগিয়েছিলেন, যাঁরা সেদিন জীর্ণ জাতির বুকে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন, তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। তাঁরা ব্যতীত স্বাধীনতা অসম্ভব ছিল। তাঁদের কথাই '**অগ্নিযুগে বিপ্লবীদের নেপথ্যে যাঁরা**' বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। অল্প পরিসরে সকলের কথা বলা সম্ভব হয়নি এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁদের প্রতি রইল আমার বিনম্র শ্রদ্ধা।

বাসুদেবপুর, হাওড়া। অচিন্ত্যকুমার মাইতি

বিষয় সূচি

বাংলায় বিপ্লবের সূচনা	৯
অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দ	১৫
ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লব	২১
বিপ্লবের প্রতীক মা সারদা	২৬
বিপ্লবীদের প্রেরণাদাত্রী সরলাদেবী চৌধুরাণী	৩৭
অগ্নিমন্ত্রে বাংলার নারী	৪০
বিপ্লবের অনুঘটক : আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম্	৫০
বিপ্লবীদের জীবনে গীতার প্রভাব	৫৪
রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন	৫৯
বিপ্লবীদের মনের মানুষ রবীন্দ্রনাথ	৬৬
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার	৭২
জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বিশ্বকবির প্রতিবাদ	৭৬
বিপ্লবীদের কাছের মানুষ শরৎচন্দ্র ও তাঁর ‘পথের দাবী’	৭৯
বিপ্লবী বন্দনায় নজরুল	৮৩
স্বাধীনতা আন্দোলনের নেপথ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভূমিকা	৮৬
অগ্নিযুগের সাহিত্য ও সমকালীন পত্রিকা	৯২

বাংলায় বিপ্লবের সূচনা

বিদ্রোহ থেকে বিপ্লবের উৎপত্তি, বিদ্রোহ ব্যতীত বিপ্লব আসে না। একটা জাতি যখন সব দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনই অপর একটি শক্তিশালী জাতি তাকে নানাভাবে নিপীড়িত করে। একটা সময় দুর্বল জাতিটি যখন অত্যাচারের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়, তখন সে বিদ্রোহী হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কঠোর অনুশাসনে সারা ভারতবর্ষ উত্তপ্ত। এল এক অন্ধকারময় নৈরাশ্যের যুগ—মানুষ ইংরেজের অনাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রমশ প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল। এরই ফলশ্রুতি ১৮৮৭ সালের 'সিপাহী বিদ্রোহ'। সেদিন 'সিপাহী বিদ্রোহ' দমনের নৃশংসতা ভারতবাসী মেনে নিতে পারল না। তাদের বিদ্রোহী চিত্ত গুমরে গুমরে মরছিল। শুরু হল সশস্ত্র বা নিরস্ত্র পন্থায় পাঞ্জাবের কুকা বিক্ষোভ, মণিপুর-আন্দোলন, মুণ্ডা অভিযান, ওয়াহাবি আন্দোলন প্রভৃতি। ভারতবাসীর সংগ্রামী মনে বিদ্রোহের স্বপ্ন নানাভাবে প্রকাশ পেতে থাকল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশ সরকারের করাল গ্রাস থেকে ভারত মুক্তির পরিকল্পনা তরুণ চিত্তকে উত্তাল করে তুলল। বিপ্লবের বাণী প্রথম শোনা গেল মহারাষ্ট্রে। অর্থাৎ মহারাষ্ট্র হল বিপ্লবের উৎসভূমি। মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণার উৎস ছিল বাল গঙ্গাধর তিলক কর্তৃক প্রবর্তিত দুটি উৎসব—সর্বজনীন গণপতি উৎসব ও শিবাজি উৎসব। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে। এটি কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা উপলক্ষ্য করে শুরু হলেও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ-বিরোধী উৎসবে পরিণত হয়। দ্বিতীয়টি সরাসরি ব্রিটিশ -বিরোধী ধ্বনি দিয়ে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন এই দুটি উৎসবই মহারাষ্ট্রের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ ও প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। উৎসব দুটি ছাড়া ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ ও ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক ম্যাৎসিনির কর্মাদর্শ থেকেও যুব সম্প্রদায় সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা পেয়েছিল। মহাবিদ্রোহ ও ম্যাৎসিনীর দৃষ্টান্ত থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের কর্মপদ্ধতিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিলকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত অন্যতম শিষ্য বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি ইংলন্ডে থাকাকালীন 'জনৈক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী' এই ছদ্মনামে '১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' নামক একটি বই লেখেন। বইটি স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করে। তিলক

মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা হলেও তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যরা নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন। এঁদের মধ্যে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় দামোদর ও বালকৃষ্ণ এবং সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় গণেশ ও বিনায়কের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিলকের দ্বারা সম্পাদিত দৈনিক 'কেশরী' পত্রিকা সেসময়ে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্লবের এক উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম একটি সুগঠিত ও কেন্দ্রবদ্ধ সংগঠন তৈরি করেন। নাম দেন 'হিন্দুধর্মের অন্তরায় বিনাশী সংঘ'। পুলিশের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য সংঘটি ধর্মীয় নাম গ্রহণ করেছিল। যুব সম্প্রদায়কে শারীরিক ব্যায়াম, সামরিক শিক্ষা, লাঠিখেলা প্রভৃতির অনুশীলন দেওয়া হত এই সংঘের মাধ্যমে। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল এই সংঘের কাজ। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ২২ জুন এই সংঘ ইংরেজদের উপর প্রথম আঘাত হানল। এই দিনটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওই দিন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় পুনার দু'জন অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করলেন। আরম্ভ হল সারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিযুগ।

২২ জুন, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ। রাত তখন সাড়ে ১১টা। পুনা শহরের গণেশখিন্দ্ এলাকায় গভর্নমেন্ট হাউসটি অবস্থিত। পুনা শহরে দু'জন ইংরেজের প্রভাবশালী কর্তা মিস্টার র‍্যান্ড ও লেফটেন্যান্ট আয়ার্স্ট বসবাস করতেন। তাঁদের অত্যাচারে ও অনাচারে অতিষ্ঠ মহারাষ্ট্রবাসী। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় সংকল্প করলেন এঁদের যোগ্য দণ্ড দিতে। এঁদের সঙ্গে আরও একজন সদস্য মহাদেব বিনায়ক রানাডে যোগ দিলেন। ওই দিন তিনজনই উপস্থিত হলেন গভর্নমেন্ট হাউসের সামনে। সিংহদ্বারের অনতিদূরে লুকিয়ে আছেন দামোদর চাপেকার। কিছু দূরে রাস্তার পাশে বালকৃষ্ণ চাপেকার আত্মগোপন করে আছেন, আরও কিছুটা দূরে ওই রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছেন রানাডে। তিনজনের সঙ্গেই মারণাস্ত্র। সরকারি-ভবনে তখন চলছে নাচ-গান-খানা-পিনা। বিপ্লবী তিনজন ভবন থেকে বহিরাগতদের লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। বেরিয়ে এলেন আয়াস্টেরা আর তার কয়েক গজ দূরে আসছিল র‍্যান্ডের ঘোড়ার গাড়ি। মুহূর্তের মধ্যে তিনজনেরই পিস্তল গর্জে উঠল। র‍্যানাডের পিস্তলের গুলি এসে আয়ার্স্টের বুক ঝাঁজরা করে দিল আর দামোদরের গুলিতে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লেন র‍্যান্ড। প্রলোভন ও নির্মম অত্যাচারের বিনিময়ে পুলিশ আততায়ীর সন্ধান পেল। তিন বিপ্লবীই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন। বিচারে তাঁদের ফাঁসির আদেশ হয়। 'র‍্যান্ড ও আয়র্স্ট হত্যা' মামলায় দামোদরের ছোটো ভাই বাসুদেবও জড়িয়ে পড়েন। তখন তাঁর বয়স তুলনায় কম, কৈশোরে বিচরণ করছেন। তাঁরও ফাঁসি হয়।

মহারাষ্ট্রের বিপ্লবের ঢেউ বাংলায় আছড়ে পড়ল। বাংলাদেশের বিপ্লবের মাটি আগে

থেকেই উর্বর হয়ে আছে। মহারাজা নন্দকুমার হলেন প্রথম বিদ্রোহী পুরুষ যিনি ইংরেজের অত্যাচার ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে এবং ইংরেজের নির্দেশ অমান্য করে ফাঁসির রজ্জু, কণ্ঠে ধারণ করলেন। এজন্যেই তিনি বিপ্লবীদের নিকট বিপ্লবের পথিকৃৎ। পূর্বে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা হলেও সেই প্রচেষ্টা কালের অমোঘ নিয়মে কিছু সময়ের জন্য ব্যর্থ হলেও আবার বৈপ্লবিক ভাবধারার অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। রামগোপাল ঘোষের সময় থেকে 'ইয়ং বেঙ্গল' (বা নব্যবঙ্গ)-এর অভ্যুদয়। ব্রাহ্মসমাজের আর্বিভাব ও বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চিন্তাধারার ওপর এর প্রভাব পড়ে। ইতিমধ্যে বাঙালি দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' পড়ে অনুধাবন করল নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় বা হিন্দুমেলা, 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি বিগদ্ধজনের স্বদেশমূলক নাটকসমূহের মঞ্চস্থ; বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি দলে দলে কবি ও লেখকের আবির্ভাব দেখা দিল। তাঁদের কবিতা, গান, নাটক ও নানা রচনার মাধ্যমে জেগে উঠল বাঙালির আত্মগরিমা, স্বাজাত্যবোধ ও আত্মবিশ্বাস। বাঙালি আবার শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়াবার সুযোগ পেল।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্ম-সম্মেলনে অকাট্য যুক্তি দ্বারা বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীর মনীষীদের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত হন। সম্মেলনে তাঁর এক ঐতিহাসিক ভাষণে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে ভারতবাসী তথা বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করেন। তাঁদের কাছে বিবেকানন্দ আদর্শ জাতীয় বীর ও জাতীয় জাগরণের প্রতীক বলে গণ্য হন। তিনি ভারতের পরাধীনতাকে জাতীয় জীবনের অভিশাপ স্বরূপ মনে করে যুবসমাজের উদ্দেশে বলেন—

'যে দেশের কোটি কোটি মানুষের অনাহারে মৃত্যু হয়, যে দেশ অস্পৃশ্যতা ও নারী উৎপীড়নের কলঙ্কে কলঙ্কিত। সে দেশ কখনই আধ্যাত্মিক শক্তির গর্ব হতে পারে না।' তিনি ভারতবাসীর ভীরুতা ও জাতীয় জীবনের বহুবিধ অনাচার ও কলঙ্কের প্রতি তীক্ষ্ণ কষাঘাত করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতবাসীকে শক্তি সাধনায় উদ্‌বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন। সেদিন এই মহান সন্নাসীর ভূমিকা কেবল 'অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল যুগেরই প্রচারক হিসাবে ছিলেন না, তিনি ছিলেন নূতন আশা, ভারতের জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতার অগ্রদূত।' ঐতিহাসিক ড. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কথায়—'বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের যুব সম্প্রদায়কে এতো গভীরভাবে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুব অভ্যুত্থান প্রধান আন্দোলন হিসাবে স্থান পেয়েছে।'